আফগানিস্তান

এ হিস্টোরি ফ্রম ১২৬০
টু
দ্য প্রেজেন্ট

জোনাথন এল. লী

অনুবাদ

হাসান বায়েজীদ

সূচিপত্র

উপক্রমনিকা	৭
অধ্যায়-এক : আফগান সালতানাতসমূহ, ১২৬০-১৭৩২	৫৭
অধ্যায়-দুই : নাদির শাহ্ ও আফগানরা, ১৭৩২-১৭৪৭	১০১
অধ্যায়-তিন : আহমাদ শাহ্ ও দূররানি সাম্রাজ্য ১৭৪৭-৭২	১৩৪
অধ্যায়-চার খণ্ডিভবন: তৈমুর শাহ্ ও তার উত্তরসূরিরা, ১৭৭২-১৮২৪	১৬৬
অধ্যায়-পাঁচ : আফগানিস্তান ও সিন্ধু সীমান্ত, ১৮২৪-১৮৩৯	২১৮
অধ্যায় ছয় : মহান পরীক্ষার মৃত্যু, ১৮৩৯-৪৩	২৮৭
অধ্যায়-সাত : বৈজ্ঞানিক সীমান্ত হাসিলের জন্যে : ১৮৪৩-৭৯	৩৬৩

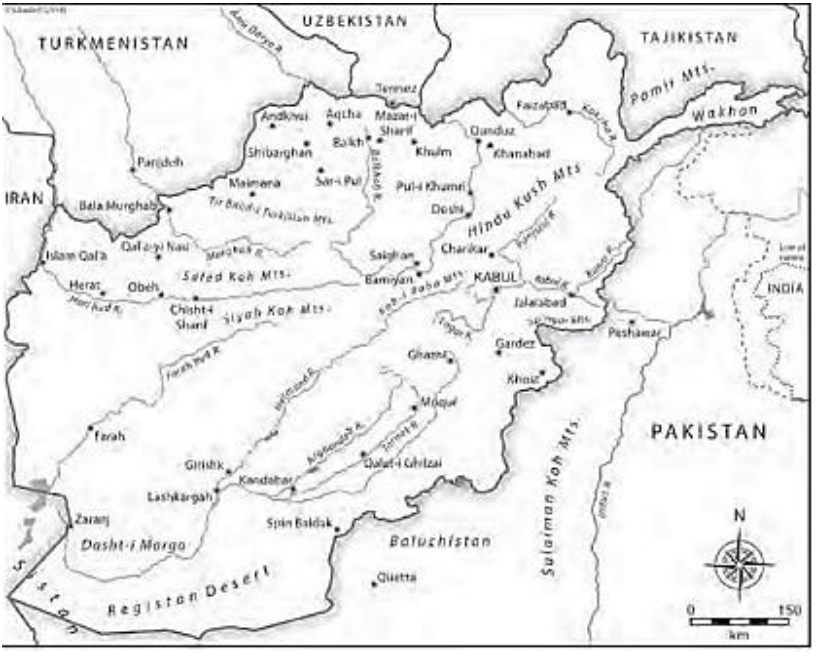

Modern Afghanistan and neighbouring states

উপক্রমনিকা

আয়তনের দিক দিয়ে আফগানিস্তান বিশ্বের চল্লিশতম বৃহত্তম দেশ, যার মানে ফ্রান্সের থেকে সামান্য বড় এবং টেক্সাসের থেকে কিছুটা ছোট। প্রশাসনিকভাবে ৩৪টি প্রদেশ অথবা *বিলায়াত* নিয়ে গঠিত হয়েছে এই দেশ, প্রতিটিই আবার বেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত, যাকে বলা হয় *বুলসওয়ালিস*। জনসংখ্যার হিসেবের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, যেহেতু রাজনৈতিক কারণবশত আফগানিস্তানে কখনোই একটি সর্বাত্মক, দেশব্যাপী আদমশুমারি পরিচালিত হয়নি। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের মতে, ২০১৫/১৬ সালে আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ২৮.৫ মিলিয়ন, কিন্তু অন্যান্য উৎসে ৩৩ মিলিয়নের উল্লেখও পাওয়া যায়। উপরন্তু, প্রায় ১ মিলিয়ন আফগান উদ্বাস্তু এখনো বসবাস করে পাকিস্তানে, আরো ২ মিলিয়নের মতো থাকে ইরানে, যখন কয়েক লাখ আফগান হয় বসবাস করছে, আর নয়তো আশ্রয় চাইছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, উত্তর আমেরিকা, এবং অস্ট্রেলিয়াতেও।

জাতিসংঘের উপাত্ত অনুসারে আফগানিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে বার্ষিক ৪ শতাংশের বেশি, যার মানে, যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত-বর্ধনশীল জনসংখ্যা রয়েছে আফগানিস্তানের। দেশটির জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বেশি বর্তমানে পনেরো বছরের নিচে। জাতিগতভাবে আফগানিস্তান কখনোই আসঞ্জনপ্রবণ ছিল না, এবং দেশটির ভাষা ও জাতিগত উপদলগুলোর আকার ও অনুপাত দীর্ঘদিন ধরে বিতণ্ডার উৎস ও রাজনীতিকদের কার্যসিদ্ধির কৌশলের শিকার ছিল। ১৯৭০ সালে পরিচালিত পোলিশ ভাষাগত সমীক্ষা অনুসারে, আফগানিস্তানে চল্লিশ ও পঞ্চাশটির মাঝামাঝি ভাষা রয়েছে, যেগুলো সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত।[১] দেশটির বৃহত্তম জাতিগত গোষ্ঠী পশতুনরা, আফগান অথবা পাঠান নামেও যারা পরিচিত, আধুনিক আফগানিস্তানের রাজনীতিতে আধিপত্যশীল শক্তি হিসেবে সুবিদিত, কিন্তু এমনকি সবচেয়ে উদার হিসেব অনুসারেও পশতুনরা আফগানিস্তানের জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ গঠন করেছে।

বস্তুত, আফগানিস্তানের থেকে বেশি পশতুন আছে পাকিস্তানে। পশতুনরা কয়েক ডজন উপজাতি নিয়ে গঠিত, ঐতিহাসিকভাবে যারা বসতি স্থাপন

করেছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তের ওপর বিস্তৃত সমতল প্রান্তর ও পর্বতের গায়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের আগে, এই অঞ্চলটি ছিল সত্যিকার আফগানিস্তান, তার মানে, আফগান উপজাতিগুলোর লীলাভূমি। এটি গঠিত হয়েছিল হেলমন্দ নদীর পূর্ব পারের অঞ্চলগুলো নিয়ে, এবং বিস্তৃত হয়েছে জালালাবাদ, কুনার উপত্যকা, সোয়াত ও চিত্রলের মতো সুদূর পূর্বের ভূখণ্ডে। দক্ষিণমুখী পশতুন বলয়টি প্রসারিত হয়েছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান প্রদেশে, সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত। পশতুন উপজাতীয় ভূখণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে শায়িত রয়েছে সাফিদ কোহ্, সোলাইমান কোহ্ এবং স্পিঙ্গার পাহাড় ও পর্বতমালা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, দূররানি রাজ্যের গোড়া পত্তনের সময় থেকে, লক্ষ লক্ষ পশতুন আধুনিক আফগানিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক অভিপ্রয়াণ, যাযাবর পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং রাষ্ট্রীয় ইন্ধনপুষ্ট উপনিবেশ স্থাপনের ফলশ্রুতি। বর্তমানে, সুপ্রচুর সংখ্যক পশতুন সম্প্রদায়ের অবস্থান পশ্চিম আফগানিস্তানের হরি রুদ ও বালা মুরঘাব নদীর ভাটি এলাকায়, এবং মাইমানা থেকে কুন্দুজে বিস্তৃত উত্তরাঞ্চলীয় সমতল ভূমির মূল শহুরে কেন্দ্রগুলোর মধ্যে, এবং ওগুলোকে আবর্তন করে। দক্ষিণ কাবুল, গজনি, ও উরুজগান প্রদেশগুলোও পশতুন-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত হয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জবরদস্তিমূলক স্থানান্তরের কারণে, যার মধ্যে রয়েছে হাজারারা, আইমাকরা, এবং অন্যান্য ফাসিভাষী সম্প্রদায়।

গিলজাই ও দূররানি পশতুন উপজাতিগুলো মিলে আফগানিস্তানের বৃহত্তম যাযাবর সম্প্রদায় গঠন করেছে, যারা মালদার অথবা কুচ্চিস নামে পরিচিত। ১৯৭০ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পশতুন যাযাবর, 'অধিকাংশ সময় বসে কাটাতে হয়' এমন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়, মূলত উত্তর ও মধ্য আফগানিস্তানে অবস্থিত তাদের ঐতিহ্যগত গ্রীষ্মকালীন পশুচারণ ভূমিগুলোতে বসবাসকারী অপশতুন সম্প্রদায়গুলোর শত্রুতা ও অমিমাংসিত গৃহযুদ্ধের জেরে। বর্তমানে, অনেক সাবেক *মালদার* কোনো মতে জীবন ধারণ করেন প্রান্তিক ভূমিতে অস্তিত্ব-নির্বাহমূলক কৃষিজীবী হিসেবে, কেউ কেউ অল্প-সময়ের বণিকে পরিণত হয়েছেন, যখন অবশিষ্টরা পাকিস্তানের পশতুন-প্রধান ট্রাক ব্যবসায় লরি চালক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

সম্ভবত আফগানিস্তানে এত বেশি সংখ্যক ফার্সি-ভাষী মানুষ রয়েছে, ঠিক যত সংখ্যক পশতুন রয়েছে। এসব মানুষকে তাজিক বলার রেওয়াজ সাধারণ, কিন্তু তারা একটি একক উপজাতি অথবা জাতিগত উপদলের সদস্য নয়, এই কারণে, সবগুলো মানুষকে গোষ্ঠীগত তাজিক তকমার অধীনে একসঙ্গে জড়

করা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। ঐতিহাসিকভাবে, *তাজিক* ছিল আরব মুসলিম হানাদারদের বর্ণনা করার একটি পরিভাষা, এবং ইরানের পূর্বাঞ্চলের, আফগানিস্তানের, অথবা মধ্য এশিয়ার অন্য কোনো অঞ্চলের আদিবাসী ফার্সি জনগোষ্ঠী নয়। আফগানিস্তানে স্বদেশী ফার্সি-ভাষীরা সাধারণভাবে তাদের গোষ্ঠীগত *ফার্সিবানস* পরিভাষার দ্বারা পরিচিত, যদিও উত্তরাঞ্চলীয় সমতলে *তাজিক* পরিভাষাটি তুলনামূলক বেশি বেশি ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় সোভিয়েত নৃকুলবিদ্যার প্রভাবের কারণে। অনেক *ফার্সিবান* শুধুমাত্র তাদের জন্মস্থান দ্বারা পরিচিত: কাবুলি, পাঞ্জশিড়ি, কোহিস্তানি, বাদাকশানি, এবং এমন আরো অনেক নাম।

পশতুনদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণরূপে, অধিকাংশ *ফার্সিবানরা* উপজাতীয় নয়, এবং তাদের জাতিগত উৎপত্তি তত্ত্ব যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমন মিশ্রও। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে চাহার আইমাকরা (সুন্নি হাজারা, ফিরোজকোহি, জামসিদি, ও তাইমানি-তাইমুরিরা), এরা হচ্ছে সেইসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী, যারা মূলত বাদ্‌ঘিস এবং দক্ষিণী ফারিয়াব ও সার-ই পুল প্রদেশগুলোতে বাস করে। ফার্সিবানরা অধিকন্তু দেশজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, যার মধ্যে পশতুন-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আছে, যেমন লোগার উপত্যকা, নাঙ্গাহার, ও গজনি। ঐতিহাসিকভাবে, ফার্সি ছিল কাচারি ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে ব্যবহৃত ভাষা, এবং ব্যাপকভাবে তা আজকের দিনেও প্রযোজ্য, যেহেতু, দারি হিসেবে সুবিদিত আফগান ফার্সিতে পশতু ও কাবুলি উপভাষা (বা আঞ্চলিক উচ্চারণ) হচ্ছে আফগানিস্তানের দুটি রাষ্ট্রীয় ভাষা, আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পশতু ভাষা না বলতে পারে, না বুঝতে পারে।

দারি, বিশেষ করে এর কথ্যরীতি, সাহিত্যিক ফার্সি ও তেহরানি ফার্সি থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন, তা যেমন শব্দ ভাণ্ডারের দৃষ্টিকোণ থেকে, তেমনই উচ্চারণের তারতম্যের ক্ষেত্রেও। এছাড়া আফগানিস্তানে প্রচলিত ফার্সি ভাষায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। ফারিয়াব প্রদেশের দক্ষিণী সীমান্ত থেকে কুন্দুজের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলীয় সমতলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ উজবেক, কিন্তু জনসংখ্যায় তুর্কমেন, তাজিক ও পশতুনদের ভাগও ছোটখাটো নয়। উজবেক ও তুর্কমেনরা আলটাইক ভাষাগত উপদলের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার উদ্ভব ঘটেছে অভ্যন্তরীণ এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোলিয় বিশ্ব থেকে। অন্যদিকে, ফার্সি ও পশতু হচ্ছে পূর্ব ইরানি ভাষা। আরো কয়েকটি ছোট ছোট তুর্কো-মঙ্গোলিয় উপদল উত্তর আফগানিস্তান, বাদাখ্‌শান, ও ওয়াখানে বসবাস করে, এবং তাদের অন্তর্গত কাজাখ, কিপচাক, কিরগিজ, ও

উইঘুররা। ফারিয়াব প্রদেশের দৌলতাবাদ অঞ্চলে দিনের অর্ধেক সময় বসে কাটাতে হয় এমন আরবদের একটি ছোট জনসংখ্যা রয়েছে, যারা আরব মুসলিম হানাদারদের সঙ্গে বংশলতিকা থাকার দাবি করে।[২]

পশ্চিম হাজারাতে পশতুন *মালদার*। ঐতিহ্যগতভাবে এইসব গিলজাই যাযাবররা গ্রীষ্মের মাসগুলো ব্যয় করে এই অঞ্চলে, কিন্তু হাজারা ও মালদারদের মধ্যেকার উত্তেজনা ও গৃহযুদ্ধের অর্থ, তাদের মধ্যে অনেকে তাদের বার্ষিক অভিপ্রয়াণ পরিত্যাগ করেছে এই অঞ্চলে এসে।

আফগানিস্তানে ভাষাভিত্তিক জাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনা অত্যন্ত জটিল, এবং দেশটির মধ্যেকার জাতিগত বিন্যাসের সব মানচিত্রকে কেবলমাত্র অবন্ধুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক হিসেবে আখ্যা দিতে হবে, এবং ওগুলো নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাবধানতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। দক্ষিণী পশতুন বলয়ের পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল ছাড়া, যেটির মধ্যে ঐতিহ্যগত উপজাতীয় সীমানা দ্বারা বিভক্ত হওয়ার প্রবণতা দৃশ্যমান, অনেক সম্প্রদায়, এবং আফগানিস্তানের সকল শহুরে কেন্দ্র কোনো না কোনো স্তরে বহুজাতিক। গ্রামীন সম্প্রদায়গুলোতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্ত্বা তাদের নিজ নিজ স্ব-পরিচালিত এলাকায় থাকে, অথবা যাকে *মহল্লা* বলা হয়, কিন্তু বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কাজ-কর্ম ব্যবস্থাপনায় সবাই অংশ নেয়। পশতুনরা, জন্মসূত্রে একটি নির্দিষ্ট উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও অভিন্ন পুরুষানুক্রম অথবা বংশগতির ধারক নয়। উপজাতীয় কুলজিতত্ত্ব বিভিন্ন ধরনের বংশলতিকার ওপর জোর দেয়, যার অধিকাংশই পৌরাণিক, এবং ফার্সি, তুর্কি, কুর্দি, আরব, আর্মেনিয় ও ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত করে।

আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকার পশতু প্রাণকেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা পশতু হলেও, অনেক পশতুন, বিশেষ করে শহুরে যারা, টেনেটুনে এই ভাষায় কথা বলে। হেরাতের খুশ্‌ক জেলায়, এবং হরি রুদের পাশ ঘেষে বসতি স্থাপনকারী পশতুনরা ফার্সি, অথবা এমনকি তুর্কমেন ভাষায় কথা বলে

মাতৃভাষা হিসেবে। একটি অভিন্ন বাস্তবতা উজবেক, তুর্কমেন ও হাজারাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উজবেকরা তুর্কো-মঙ্গোলিয় উপজাতিগুলোর একটি ঘনসন্নিবেশ, যারা মূলত এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিস খানের বিজয়ের ধারাবাহিকতায়, যখন বিপুল সংখ্যক তুর্কমেন উপজাতি আফগানিস্তানে তার প্রতিনিধিত্ব করত। পশ্চিমা নৃতত্ত্বের প্রভাবে, অনেক হাজারারা বর্তমান সময়ে চেঙ্গিস খানের মঙ্গল গ্যারিসনের সদস্য, অথবা স্বয়ং মঙ্গল বিজেতার সঙ্গে বংশ সূত্রের দাবি করে। হাজারাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে মঙ্গল রক্ত ও উত্তরাধিকার রয়েছে, এবং তাদের আঞ্চলিক ফার্সি, হাজারাজি, উচ্চারণে মঙ্গোলিয়-ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন শব্দ মিশে রয়েছে।[৩] যা হোক, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় মিশ্র, এবং পারস্যদেশীয় ও তুর্কি জনগণের সঙ্গে পুরুষানুক্রমিক যোগসূত্রের অধিকারী, যারা আরব মুসলিম আগ্রাসনের পূর্বাপর এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল।

আফগানিস্তানের আকার ও পবর্তময় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বরাবরই যোগাযোগ ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, এবং তা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটি শক্তিশালী অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে। ২০০১ সাল থেকে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় বড় অগ্রগতি সত্ত্বেও, এখনো কেবলমাত্র একটি নামমাত্র খোলা, সকল আবহাওয়ার উপযোগী রাস্তা রয়েছে, যা কাবুলকে উত্তরাঞ্চলীয় বড় শহর মাজার-ই শরিফের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, এবং কাবুলকে কান্দাহার ও হেরাতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। আফগানিস্তানের পল্লী অঞ্চলে, অনেক রাস্তাঘাট শুধুমাত্র চার-চাকার যান চলাচলের উপযোগী, এবং অনেক মানুষ এখনো গাধা ও ঘোড়াকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন, যখন দরিদ্র মানুষদের নিকটবর্তী বাজার অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছানোর একমাত্র ভরসা নিজের পা।

দেশের কেন্দ্রস্থলে প্রাধান্য বিস্তারকারী সারি সারি পর্বত কার্যকরভাবে দেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে, এবং আধুনিক আফগানিস্তান রাষ্ট্র পত্তনের আগে, এসব পর্বতমালা ভারত এবং বল্‌খের সমতল ও মধ্য এশিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত হিসেবে পরিগণিত হতো। এই যুগে, বালা মুরঘাব, বামিয়ানের উত্তরে সাইগন উপত্যকা, চারিকর ও কাবুল ছিল সীমান্ত ফাঁড়ি। কেন্দ্রীয় পার্বত্যাঞ্চল ধারাবাহিক কতগুলো পর্বতশ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেগুলো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমান্বয়ে উঁচু। উত্তর-পশ্চিমে, তির বান্দ-ই তুর্কিস্তানে চুনাপাথরের মালভূমি বিস্তৃত হয়েছে বালা মুরঘাব থেকে সার-ই পুলের পূর্ব দিক পর্যন্ত, যেখানে এটি মিতালি পেতেছে কোহ্-ই আলবুর্জের সঙ্গে। পাহাড়-পর্বতের এই শৃঙ্খল মাঝে মাঝে ভেঙে দিয়েছে গভীর, সংকীর্ণ গিরিখাত, এবং এই হেতুক,

দেশের সবচেয়ে কম অন্বেষিত অঞ্চলগুলোর অন্যতম এটি। এই চুনাপাথরের মালভূমির উত্তর দিকে নির্গত বারোমেসে সরোবর হচ্ছে সেইসব নদীর মূল উৎস, যেগুলো ভাটির উপত্যকা ও বল্‌খ সমতলের সেচ ব্যবস্থার প্রাণ। হরি রুদের উত্তর ও দক্ষিণে শায়িত আছে শাফিদ কোহ্, ও সিয়াহ্ কোহ্ পর্বতমালা, যেগুলো শেষপর্যন্ত পূর্ব দিকে কোহ্-ই-বাবায় এসে মিলেছে, যার তুষার ঢাকা চূড়া হাজারাজাতের দিগন্ত রেখার নয়ানাভিরাম দৃশ্য নির্মাণ করেছে।

কোহ্-ই বাবা এরপর দক্ষিণ আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ এবং উত্তরপূর্বদিকে বাদাখ্‌শান অঞ্চলে পামির মালভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে, যেগুলো হিমালয় পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্ত হিসেবে সুপরিচিত। আরো এক সারি পর্বতমালা আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের পাশ দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে শায়িত আছে রুক্ষ দশ্‌ত-ই মার্গো, মৃত্যুর মরুভূমি (*ডেজার্ট অফ ডেথ*), এবং রেজিস্তান ও সিস্তানের মরুভূমি। উত্তরের সমতল প্রান্তরে দৌলতাবাদ ও শিবারঘানের মাঝখানে দশ্‌ত-ই লাইলি হচ্ছে আরো একটি ছোট আধা মরুময় অঞ্চল। আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের মধ্যাঞ্চলীয় উচ্চভূমি ও হিল কাউন্ট্রি প্রাচীন গমনপথের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত, যেগুলো সহস্রাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষকে অভ্যন্তরীণ এশিয়া, ইরান ও চীনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, এবং যেগুলো যেমন বণিকরা ব্যবহার করেছেন, তেমন হানাদাররাও, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, পারস্য ও আরব বিজেতাগণ, অভ্যন্তরীণ এশিয়ার কিছু তুর্কো-মঙ্গোলিয় উপজাতি, এবং সর্বোপরি উত্তর ভারতীয় রাজবংশের রাজারা।

মধ্যাঞ্চলীয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ কঠিন, এমনকি বছরের সবচেয়ে অনুকূল সময়েও, এবং শেষ অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গিরিপথ ও উজানের উপত্যকাগুলো তুষারে আচ্ছাদিত থাকে। ১৯৫০ এর দশকে, সোভিয়েত প্রকৌশলীরা সালাঙ গিরিপথের মধ্য দিয়ে একটি নতুন রাস্তা ও সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করেন, যেটি কাবুল থেকে মাজার-ই শরিফে গাড়ির দূরত্বকে একদিনের কম সময়ে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু সালাঙও প্রায়শই তুষারে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, এমনকি ভরা শীতে কখনো কখনো হিমবাহও নেমে আসে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরো দুটি ঐতিহাসিক পথ সরাসরি আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের পর্বতমালায় পৌঁছানোর উপায় তৈরি করেছে। এর মধ্যে দক্ষিণেরটি, কান্দাহারকে খোজাক গিরিপথের মাধ্যমে কোয়েটা ও বেলুচিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, যখন উত্তরপূর্ব দিকে খাইবার গিরিপথ এখনো কাবুল ও পেশওয়ারের মাঝখানে একমাত্র মূল মহাসড়ক। ঐতিহাসিকভাবে আরো অনেকগুলো ছোটখাটো গমনপথ দক্ষিণ আফগানিস্তানকে সিন্ধু সমতলের সঙ্গে

সংযুক্ত করেছে, কিন্তু বর্তমানে ওগুলো মূলত স্থানীয় উপজাতি, যাযাবর, চোরাচালানকারী ও বিদ্রোহীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

মধ্যাঞ্চলীয় মালভূমির পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে রয়েছে বিস্তীর্ণ উর্বর সমতল, যেগুলো আফগানিস্তানের মূল কৃষি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এসব অঞ্চলের সেচের মূল উৎস তুষার গলা নদীর পানি: 'তুষারবিহীন থেকে স্বর্ণবিহীন কাবুল শ্রেয়তর' প্রবাদটি গোটা আফগানিস্তানের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে, কারণ যখন তুষার গলন ও বসন্তের বৃষ্টির আকাল দেখা যায়, তখন খরার প্রাদুর্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠে। নাঙ্গাহার ও দক্ষিণপূর্ব আফগানিস্তান ছাড়া, মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশজুড়ে বৃষ্টিপাত হয় খুব সামান্য, এবং অধিকাংশ নদীর পানি উঠানামার ক্ষেত্রে মৌসুমী প্রভাবের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বসন্তে, পানি প্রবাহের সবচেয়ে রমরমা সময়ে, যখন তুষার গলতে শুরু করে এবং বৃষ্টি নেমে আসে, নদীগুলো তখন উত্তাল স্রোতস্বীনির রূপ ধারণ করে, স্থানীয়ভাবে সীমিত বন্যা ও ভূমিধ্বসের উদ্ভব ঘটায়, রাস্তাঘাট প্লাবিত করে, সেচ কাজের জন্যে খননকৃত খাল ও নির্মিত বাঁধগুলোকে ধ্বংস করে। অতিমাত্রায় পশুচারণ ও দেশের বেশিরভাগ বনভূমির বিনাশ পরিস্থিতিকে শুধু আরো খারাপ করতে অবদান রাখে। তথাপি, শেষ গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ক্ষীয়মান প্রবাহের সময়, অনেক নদীর নিম্ন গতিপথে পানির স্তর শুকিয়ে একটি ক্ষীণ ধারায় পরিণত হয়।

আফগানিস্তানের সব নদী কোনো না কোনো ব্যাপ্তিতে সেচের জন্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাত্র হাতে গোণা কয়েকটির ইস্পাতের তৈরি নিয়ন্ত্রণ ফটক রয়েছে, অথবা কংক্রীট-নির্মিত পার, ও খাল। অধিকাংশ সেচ ব্যবস্থা অচিহ্নিত, এবং ভিন্নমুখিকরণ কাঠামোগুলো তৈরি হয়েছে জমাটবদ্ধ মাটি অথবা পাথরের সাহায্যে। সেচ কাজে ব্যবহৃত খালগুলোর ব্যবস্থাপনা একটি শ্রমঘন বিষয়, এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অংশীদাররা খালগুলোতে ক্রমবর্ধমান পলি সঞ্চিতি অপসারণে কাজ করেন, পাশাপাশি বসন্ত ও শরতে পানির প্রবাহ পরিবর্তনের জন্যে দায়ী কাঠামোগুলোর মেরামতিরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেচ নেটওয়ার্কের আওতার মধ্যে পানির বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার কর্মভার দেওয়া হয় কমিউনিটি-নিয়োগকৃত একজন পানি গোমস্তার হাতে, যে *মিরাব* নামে পরিচিত। সেচের আরো একটি ঐতিহ্যবাহী উৎস হচ্ছে ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণ, যেগুলোর পানি প্রবাহিত হয় ভূগর্ভস্থ প্রণালীর মধ্য দিয়ে, যেগুলো *কারেজ* নামে পরিচিত। দেশটির প্রধান প্রধান জল-সঞ্চয়কারী স্থাপনাগুলোর অবস্থান দক্ষিণ আফগানিস্তানে, যদিও ছোট নদীগুলোর ওপর অপেক্ষাকৃত ছোট, স্থানীয়ভাবে পরিচালিত বাঁধ রয়েছে।

ইয়াকুয়ালাঙ ও বামিয়ানের মধ্যবর্তী খাম গিরিপথ অতিক্রম।
মে'র প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সুউচ্চ মালভূমি তুষারে ঢাকা থাকে।

এসব বাঁধ যেমন একদিকে সেচের জন্যে পানির জোগান নিশ্চিত করে, তেমনই আশপাশের শহুরে কেন্দ্রগুলোতে সীমিত ও প্রায়শই সবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহেও কাজে লাগানো হয়। আফগানিস্তানে সব বাঁধ ও সরঞ্জামাদি যুগজীর্ণ হয়ে পড়ছে, এবং আশু মেরামতের দাবি রাখে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁধগুলোর মধ্যে দুটি, আরঘানদাব নদীর ওপর দুরন্ত, এবং হেলমন্দের ওপর কাজাকি বাঁধ কার্যক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এবং নিয়ন্ত্রিত হয় বিদ্রোহীদের দ্বারা। ২০১৬ সালে, হরি রুদের ওপর ভারতীয়-অর্থায়নপুষ্ট সেলমা বাঁধ শেষপর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়, সোভিয়েত আগ্রাসন ও পরবর্তী গৃহযুদ্ধের মুখে ১৯৭০ এর দশক থেকে প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। বর্তমানে অন্তত আরো পনেরোটি বড় আকারের দ্বৈত-ব্যবহারোপোযোগী জল-সঞ্চয়মূলক স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের হাতে রয়েছে, যদিও এধরনের বিরাট প্রকল্পের অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে তা কারোরই জানা নেই।

আফগানিস্তানের পাঁচটি বড় নদী অববাহিকা রয়েছে: কাবুল, আমু দরিয়া, বল্‌খ আব, মুঘরাব-হরি রুদ, এবং হেলমন্দ-আরঘানদাব।[৪] আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল, কাবুল নদীর তীরবর্তী একটি মালভূমির ওপর শায়িত, যেটি সমুদ্র সমতল থেকে ২,০০০ মিটার (প্রায় ৬,৫৬০ ফুট) উঁচুতে। শহরটির অবস্থান বা গুরুত্বের কৃতিত্ব সিন্ধু সমতল, বামিয়ান, বল্‌খ ও মধ্য এশিয়া

জুড়ে বিস্তৃত এর কৌশলগত অবস্থানের, যদিও বর্তমানকালের কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কটি নির্মিত হয়েছিল মধ্য বিশ শতকে। প্রাচীন কাফেলা চলাচলের পথটি বাট খাক, খুর্দ কাবুল গিরিসংকট, তেজিন ও গন্দমাক এর মধ্য দিয়ে আরো দক্ষিণে চলে গেছে। আজকের কাবুল একটি এলোমেলোভাবে গড়ে উঠা ঘর-বাড়ির গোলক ধাঁধা। জাতিসংঘের উপাত্ত অনুসারে, ৪৬ লাখের বেশি জনগণ এখন আফগান রাজধানীতে বসবাস করেন, বিশ্বের মধ্যে যেটির শহুরে প্রবৃদ্ধির হার অন্যতম দ্রুততম।

কাবুলের বাড়ন্ত জনসংখ্যা, যা হোক, একটি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক প্রপঞ্চ। ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি জনসংখ্যা ছিল খুব সম্ভবত মাত্র ১০ লাখের কাছাকাছি, এবং অধিকাংশ আফগান বসবাস করতেন গ্রামীণ বসতিতে, এবং শহুরে কেন্দ্রগুলোতে নয়। কাবুলের অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃদ্ধি দেশজুড়ে শহরায়ণের ক্ষেত্রে পালাবদলের লক্ষণসূচক, একটি এমন প্রবণতা যা ইতোমধ্যে অপ্রতুল শহুরে অবকাঠামোর ওপর গুরুতর চাপ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে কাবুল বিশ্বের সর্বাধিক দূষিত শহরগুলোর অন্যতম, এবং এর বর্গজালির মতো রাস্তাগুলো যানজট কবলিত। কাবুল ঘিরে আছে অনেকগুলো উর্বর উপত্যকা (লোগার, কোহ্ দামান ও তাগাব), যেগুলো সুদূর অতীতকাল থেকে রাজধানীর খাদ্য সরবরাহের উৎস হিসেবে অবদান রাখছে। যা হোক, রাজধানীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে, ঠিক যেমন বিদেশি ও মধ্যবিত্ত আফগানদের মধ্যে বিলাসী পণ্যের চাহিদার কারণেও, কাবুলের অধিকাংশ, যদি সব না হয়ে থাকে, পণ্য আমদানি করা হয় পাকিস্তান, ইরান ও দুবাই থেকে।

কাবুলের উত্তর দিকে, কোহ্ দামানের অত্যধিক উর্বর উপত্যকা একদা আঙুর ও নরম ফলের প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল ছিল, যখন কোহ্ দামানের উত্তরপূর্ব দিকে পাঞ্জশির উপত্যকা বিখ্যাত ছিল তুঁতফলের জন্যে। কাবুলের পশ্চিম দিকে পাঘমানের ভূতপূর্ব রয়্যাল হিল স্টেশনটি অবস্থিত ছিল, এবং এটি, পাঘমান পর্বতশ্রেণির পূর্ব মুখে শায়িত শেখের দার্‌রার মতো অন্যান্য বসতির পাশাপাশি, এবং পাঞ্জশির গিরিখাদের মুখে গুল বাহার ছিল কাবুলিদের জন্যে বিখ্যাত পিকনিক স্পট। সোভিয়েত দখলদারিত্বের দশক জুড়ে, এবং সোভিয়েত-উত্তর যুগে, কোহ্ দামান এবং পাঞ্জশির ছিল আফগানিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে তিক্ত লড়াইয়ে পর্যুদস্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি, যেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা খনি ও কামানের অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ-পরিকীর্ণ পরিত্যক্ত পতিত জমিতে পরিণত হয়েছিল। কোহ্ দামানে আজকের দিনে কৃষি কর্মকাণ্ড এখনো আরোগ্যের পর্যায়ে আটকে আছে। কোহ্ দামানে *ফার্সিবান*দের

প্রাধান্য লক্ষণীয়, যদিও যখন কেউ চারিকার-বামিয়ান সড়কের ওপর ঘুরবান্দ উপত্যকা ধরে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন ক্রমবর্ধমানরূপে হাজারা বসতিগুলোর প্রাধান্য চোখে পড়ে।

উপত্যকার পূর্ব দিকে অনেকগুলো সমৃদ্ধিশীল পশতুন বসতি দেখা যায়, যখন চারিকার ও সারোবির মধ্যবর্তী কৌশলগত সড়কটি নিয়ন্ত্রণ করত কাপিসা প্রদেশের তাগাবের অন্তর্গত সাফিরা। বিপুল সংখ্যক পাশাই, যারা একটি দার্দিক ভাষায় কথা বলে, হিন্দুকুশ পাহাড়ের পাদদেশে এবং কাপিসা থেকে দার্‌রা-ই-নূর ও কুনারে বসবাস করে। কাবুল প্রদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিকে পশতুন উপজাতিগুলো, বিশেষ করে গিলজাইরা, নেতৃস্থানীয় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যদিও সেখানে কাবুল নদীর উজানে কিছু ফার্সি-ভাষী বসতিও রয়েছে, জালরেজ অঞ্চল ও লোগারের পাশ ঘেঁষে। গজনির আশপাশে, মাটির নিচে বিপুল পরিমাণ লৌহ মজুদ রয়েছে, এবং লোগারের মেস আইনাকে বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে সমৃদ্ধ কপারের স্তর রয়েছে, যদিও এসব সম্পদ এখনো উত্তোলন করা হয়নি। ওয়ারদার প্রদেশের মায়দান শেহর এর আপেলের জন্যে বিখ্যাত, যখন আফগানিস্তানের সবচেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহরগুলোর অন্যতম গজনি, গজনভি রাজবংশের রাজধানী ছিল (৯৭৭-১১৮৬) (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)। গজনির চিত্তাকর্ষক মধ্যযুগীয় দুর্গ এখনো নগরীতে কর্তৃত্ব চালায়, এবং নগর প্রাচীরের বাইরে গজনভি সুলতানদের সমাধি, তাদের নির্মিত প্রাসাদ ও দুটো মিনারের অবশিষ্টাংশ রয়েছে।

কাবুল নদীর ভাটির তীরে অবস্থিত নাঙ্গাহার, দেশটির একমাত্র প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, বরফ-মুক্ত অঞ্চল, যেটি ভারতীয় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের শেষাংশের কিছু সুফল ভোগ করে। নাঙ্গাহারের প্রাদেশিক রাজধানী জালালাবাদ, কাবুল ও পাকিস্তান সীমান্তের মধ্যবর্তী একটি ব্যস্ততাপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্র, এবং আফগানিস্তানের রপ্তানি ও আমদানির একটি বৃহৎ অংশ এই শহরের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। জালালাবাদের বিদ্যুৎ আসে সারোবি বাঁধ থেকে, যখন এসব জল-সঞ্চয়মূলক স্থাপনার অন্যতম একটি সেচ প্রকল্পে পানি জোগান দেয়। নাঙ্গাহার সমতলে নিবিড়ভাবে চাষাবাদ করা হয়। এখানে চাল, জলপাই ও সিট্রাস ফল জন্মায়, এবং সাম্প্রতিক সময়ে ফুলকপি একটি প্রধান রপ্তানি শস্যে পরিণত হয়েছে, যখন সুরখাব নদীর তীরে খোগিয়ান জেলায় এপ্রিকট, আখরোট, এলমণ্ড ও আঙ্গুরের চাষ করা হয়।

আজকের দিনে নাঙ্গাহারের সবচেয়ে লাভজনক ও ব্যাপকভাবে আবাদকৃত শস্য হচ্ছে, যা হোক, আফিম। দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় পর্বতমালা একদা আচ্ছাদিত ছিল জুনিপার ও হলি হোক বৃক্ষের বনভূমিতে, কিন্তু অবৈধ বৃক্ষ কর্তনের জেরে এর যৎকিঞ্চিত অবশিষ্টাংশ এখন টিকে আছে: আফগানিস্তানের

মোট স্থলভাগের মাত্র ১.৩ শতাংশে এখন বনভূমি রয়েছে—বিশ্বের বুকে সর্বনিম্ন অনুপাতগুলোর একটি। নাঙ্গাহার অঞ্চল ও পশ্চাদ্‌ভূমি প্রায় অনন্যভাবে পশতুন এবং প্রভাবশালী কিছু উপজাতির আবাস, যার অন্তর্গত আফ্রিদি, খোগিয়ানি, লুডিন, মোহমান্দ, সাফি, শেরজাদ ও শিনওয়ারিরা।

দক্ষিণ-পশ্চিমে খোস্তের জাজি ও মঙ্গল উপজাতির লোকদের আবাস, যখন হিন্দুকুশের উঁচু ও তুষার-ঢাকা পর্বতমালায় বসতি স্থাপন করেছে নূরিস্তানিরা। ইতিপূর্বে কাফিরিস্তান নামে পরিচিত এই উপজাতিগুলো বহুদেববাদী ছিল, যাদের ধর্ম বৈদিক ও প্রাচীন ইন্দো-আরিয়ান ঐতিহ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৮৯০ এর দশকে আফগানিস্তানের আমির এলাকাটিতে অভিযান চালান, জোর করে অধিবাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন, এবং অঞ্চলটির নতুন নাম দেন নূরিস্তান, আলোর ভূখণ্ড। আরো একটি সংখ্যালঘু ভাষাভিত্তিক জাতিগোষ্ঠী পাশাইদের আবাস কুনার নদীর মোহনায়, ও দার্‌রা-ই-নূরের তীরে।

কাবুল নদী ও কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়ক থেকে সারোবিতে ভাটির দৃশ্য। সোভিয়েত যুগে রাস্তাটি ব্যাপকভাবে চলাচলের অযোগ্য করা হয়, কিন্তু বর্তমানে মেরামত ও বন্ধ করা হয়েছে।

আমু দরিয়া নদী, অথবা ওজুস, চিরন্তন সূত্রগুলোতে যে নামে পরিচিতি পেয়েছে, উত্তরপূর্ব আফগানিস্তানে চীন ও তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছে পামির মালভূমির ওপর জেগে উঠেছে। এটি মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম, এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় আন্তর্জাতিক

সীমানা গঠন করেছে। তদানীন্তন ইউএসএসআর, এবং সম্প্রতিকালে উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের চাপের কারণে, আফগানিস্তান কখনোই আমু দরিয়াকে সেচ কাজের জন্যে ব্যবহার করেনি, যদিও সীমান্তের অন্যদিকে, এর পানি প্রবাহকে বিস্তীর্ণ খালের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের তুলা ক্ষেতগুলোর তৃষ্ণা মিটিয়েছে। আফগানিস্তানের চরম উত্তরপূর্বাঞ্চল হিসেবে সুবিদিত ওয়াখানে, যেখানে আমু দরিয়ার উন্মেষ ঘটেছে, নগণ্য সংখ্যক কিরগিজ বসবাস করে, এবং বেশিরভাগই তাদের গবাদি পশুর ওপর নির্ভরশীল। বাদাখ্শানে শুধুমাত্র সীমিত পরিসরের কৃষিকাজ সম্ভব, যেহেতু শীতের স্থায়িত্ব যেমন দীর্ঘ তেমন প্রচণ্ডতাও বেশি, কিন্তু প্রদেশটির খনিজ সম্পদের মজুদ উল্লেখযোগ্য। নীলকান্তমনি, এমারেল্ডস, রুবি ও অন্যান্য মূল্যবান, কিংবা কম মূল্যবান রত্ন ও পাথর হাজার বছর ধরে এখানে মজুদ আছে, এবং সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ এমন ইংগিত করে যে প্রদেশটিতে বিপুল পরিমাণ কপার, লৌহ ও মার্বেল সঞ্চিতি রয়েছে। কোকচা নদীর মোহনায়, কাঁকর থেকে স্বর্ণ ছেঁকে আলাদা করার জন্যে ভেড়ার লোম ব্যবহার করা হয়।

ইমাম সাহিবের নিচে, আমু দরিয়ার গতি ক্ষীণ হয়ে গেছে, এবং একটি উর্বর সমতলে বিস্তৃত হয়েছে, যেটি কুন্দুজ নদী ও এর শাখা প্রশাখার পানিবিধৌত। একদা ম্যালেরিয়ার সূতিকাগার হিসেবে কুবিদিত জলাভূমিটি ১৯৪০ ও ৫০ এর দশকে খালি করা হয়, এবং কুন্দুজে সাম্প্রতিক গোলোযোগের আগপর্যন্ত আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল ছিল এটি। অঞ্চলটিতে উজবেক উপজাতির প্রাধান্যপূর্ণ উপস্থিতির কারণে কুন্দুজ ইতিপূর্বে কাতাঘান নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে কাবুলের সরকার দক্ষিণের হাজার হাজার পশতুন ঔপনিবেশিককে উৎসাহিত করেছে এলাকাটিতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে, এবং পুনরুদ্ধারকৃত জলাভূমিতে ক্ষুদ্র জোত তাদেরকে বরাদ্দ দেয়। ১৯২০ ও ৩০ এর দশকে বুখারা, ফারগানা, দুশানবে, ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য সোভিয়েত-নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে আগত উজবেক, তুর্কমেন ও তাজিক উদ্বাস্তুরা একে বাসভূমি বানায়। কুন্দুজ এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গোছা বাঁধা শতরঞ্চির জন্যেও বিখ্যাত, যেগুলো উজবেক নারীদের হাতে বোনা।

বল্খ সমতল, যেটি পশ্চিম দিকে খুম থেকে মাইমানা পর্যন্ত বিস্তৃত, তির বান্দ-ই তুর্কিস্তান ও হাজারাজাতে উদ্ভূত নদীর পানি দ্বারা বিধৌত, যদিও তাদের সবগুলো আমু দরিয়ায় পৌঁছানোর আগেই শুকিয়ে যায়। এতদঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী বল্খ আব এর উৎস হচ্ছে বন্দ্-ই আমিরের নীল নীল হ্রদগুলো, বামিয়ানের উত্তরে। এর ভাটির দিকে হাজদা নহর বা *আঠারোটি খাল* বলে পরিচিত প্রাচীন কালের এবং বিস্তীর্ণ একটি সেচ প্রকল্পে পানি জোগান দেয় বল্খ আব, যা একটি স্থলভাগ পরিবেষ্টিত বদ্বীপ গঠন করেছে,

যেটি এর শীর্ষবিন্দুতে আকচার উত্তর থেকে মাজার-ই শরিফের পশ্চিম দিক অব্দি বিস্তৃত। আজকের দিনে, মাত্র দশটি খাল কার্যকর অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, এবং ক্রমবর্ধমানরূপে অবৈধ পানি আহরণ সত্ত্বেও, হাজদা নহর নেটওয়ার্কে দ্বৈত ফসল আবাদের ঐতিহ্য এখনো সাধারণ, এবং ধান ও তুলা ব্যাপক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের তরমুজ স্বাদ ও বিশাল আকৃতির জন্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তির বান্দ্-ই তুর্কিস্তানের উত্তর মুখের পাশ ঘেঁষে শায়িত আছে একটি উচুঁ, হলুদাভ ধূসর মাটির বালিয়াড়ি, যেটি *চুল* নামে পরিচিত, এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লালমাই, অথবা বৃষ্টি-বিধৌত, গম উৎপাদনকারী এলাকা।

এই পর্বতমালার ভাটির উপত্যকায় আখরোট ও তুঁতফলের কোনো অভাব নেই, এবং অপ্রক্রিয়াজাত রেশমও এখানে ব্যাপক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। উত্তরের সমতলে উল্লেখযোগ্য ব্যাপ্তিতে মারিজুয়ানা ও আফিম চাষ করা হয়। তির বান্দ্-ই তুর্কিস্তানে বিশাল কয়লার মজুদ রয়েছে, এবং দার্‌রা-ইউসুফ ও পুল-ই খুমরিতে রয়েছে কয়লার খনি, কিন্তু কয়লা উত্তোলন করা হয় খুবই সীমিত পরিসরে, এবং সেটিও করা হয় প্রাক-শিল্পায়ন যুগের পদ্ধতি ব্যবহার করে, এক্ষেত্রে সরঞ্জাম মূলত গাঁইতি ও শাবল। খনিজীবীদের কাজের পরিবেশ বড় ভয়ানক, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান দৃশ্যত অনুপস্থিত, এবং খনিকূপ ধ্বসের কারণে প্রাণহানির ঘটনাও অহরহ ঘটে।

সার-ই পুল এবং শিবারঘান এলাকায় তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে, এবং পাইপে করে শিবারঘান ও মাজার-ই শরিফে গ্যাস সরবরাহ করা হয়, প্রধানত গৃহস্থালি কাজের জন্যে; অতীতে, মাজার-ই শরিফের দক্ষিণে একটি সার কারখানাতেও এই গ্যাস সরবরাহ করা হতো। উত্তোলিত অশোধিত তেল পরিশোধনের ব্যবস্থা খুব একটা সন্তোষজনক নয়, এবং মূলত ওয়াটার হিটারের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যদিও খুব সামান্য পরিমাণ রপ্তানিও করা হয়। পুল-ই খুমরিতে ইতিপূর্বে একটি সিমেন্ট কারখানা ছিল, এবং বড় আকারের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তুলা-প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, কিন্তু এগুলো বর্তমানে সর্বস্বান্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর মধ্যে মাজার-ই শরিফ বৃহত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমে বল্‌খ ছিল অঞ্চলটির রাজধানী। প্রাক-ইসলামি যুগে এই শহরটি পরিচিত ছিল ব্যাকট্রা নামে, এবং খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে (সারণি ১ দ্রষ্টব্য) এটি ছিল ব্যাকট্রিয়ার